স্মৃতিকথা

প্রায়োপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব

ফজলুল বারী

নিয়মিত কাজে লাগাতেন পাপড়ি কবিতায় ভালোবাসার দাবি।

মিনার মাহমুদের তখনও অফিসিয়েল একটি ঘর সংসার আছে। কিন্তু তারপরও পাপড়ি কবিতার তাকে অন্ধের মতো ভালবাসাবাসির বিষয়টি বিচিন্তার বেশিরভাগ কর্মী পছন্দ করতেন না। আবার আমাদের কাছে মুখে নানা বিরক্তি দেখালে বোঝা যেত রমণীমোহন মিনার মাহমুদ পুরো বিষয়টিকে বেশ এনজয় করেন। উৎসাহ-প্রশ্রয়

বিচিন্তা নিষিদ্ধের পর আমরা বেকার। প্রতিদিনের রিপোর্ট, প্রতি সপ্তাহের পেস্টিং ছাপা, পত্রিকা বের করার তাড়া নেই। নতুন নতুন প্রচ্ছদ আঁকার ব্যস্ততা নেই শিল্পী মাসুক হেলালেরও। একদিন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ছুটে এসে বলেন বিচিন্তার নিষিদ্ধ সংখ্যার 'চট্টগ্রামের গণহত্যা আর নিরোর বাঁশি' প্রচ্ছদটি আঁকার দায়ে এজেন্সির লোকজন তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে বাসা ঘেরাও করেছিল। তিনতলার রেলিং শাড়িতে পেঁচিয়ে কোনক্রমে পালিয়ে নেমে এসেছেন।

প্রিয় সম্পাদক মিনার মাহমুদ কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। প্রায়দিন নাজিম উদ্দিন রোডের কারাগার নামের লাল দালানের ফটকে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। সঙ্গে ফিন্যান্সার ম্যাডামের দেয়া নানান

খাবার ভর্তি ঢাউস আকারের টিফিন ক্যারিয়ার, নানান রকমের বিস্কিট, সিগারেটের কার্টন নিয়ে যাই। কারারক্ষীরাই সেগুলো বয়ে ভিতরে নিয়ে যায়।

কিন্তু কারাফটকেও মিনার মাহমুদকে মনে হয় বেশ চাঙ্গা। হাসিখুশি। কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে বা চলছে তা তার চলনে বলনে আচরণে বোঝার উপায় নেই। আমাদের কাছে পেলেই জেলখানার ভিতরের মজার সব অভিজ্ঞতার গল্প বলেন। এজেন্সির লোকগুলো সব কানপেতে শুনতে চায়। আবার কিছু একটা ইশারা পেলেই সরে দাঁড়ায়। কিছুই দেখছি না কিছুই শুনছি না ভাব করে।

ফিন্যান্সার ম্যাডাম কারা ফটকের লোকজনগুলোকে টাকায় বশ করে ফেলাতে দেখা করা নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। ফটকের লোকজন শুধু কৌশলে বলে আপনারা মাঝে মাঝে আসবেন। এভাবে প্রতিদিন আসবেন না। আমরাওতো ছোট চাকরি করি। কে আবার কোনদিকে কমপ্লেইন দিয়ে দেয়।

প্রতিদিন দুপুরের পর বইমেলায় চলে যাই বিচিন্তার স্টলে। বিচিন্তা নিষিদ্ধ, মিনার মাহমুদ গ্রেফতার এসব খবরের কারণে দলে দলে শুভার্থী, পাঠকরা আমাদের খোঁজ নিতে আসেন। এই সুযোগে মিনার মাহমুদের গল্পগ্রন্থ 'মনে পড়ে রুবি রায়'র বিক্রি অসম্ভব বেড়ে যায়। শুভার্থী প্রায় সবাই গল্পগ্রন্থটির একটি করে কপি কিনে নিয়ে যান।

প্রায় প্রতিদিন স্টলে আসেন আম্মা, জাহানারা ইমাম। শহীদ রুমির মা। শহীদ জননী। আমরা তখনও তাঁকে মূলত 'একাত্তরের দিনগুলো' সাড়াজাগানো গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই চিনি জানি। বইটি নিয়ে বিচিন্তায় আনোয়ার শাহাদাতের লেখা রিভিউ ছাপার পর সেটির বিক্রি, আম্মার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা দু'টোই বেড়েছে।

তৎকালীন বিচিত্রা বর্তমান সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী শহীদ রুমির সহযোদ্ধা ছিলেন। রুমি শহীদ হবার পর শাহাদত চৌধুরী সহ তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধুরাও শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে আম্মা ডাকতে শুরু করেন। সেই সূত্রে মিনার মাহমুদ তথা বিচিত্রা জেনারেশনের সবাই তাঁকে আম্মা ডাকতেন। জাহানারা ইমাম হয়ে ওঠেন বিচিন্তা পরিবারেরও আম্মা।

প্রতিদিন বইমেলায় এসে বিচিন্তার স্টলে বসে আম্মা মিনার মাহমুদ এবং আমাদের সর্বশেষ খোঁজখবর নেন। জামিনের কি চেষ্টা চলছে, আমাদের খাওয়া দাওয়া, খরচাপাতি চলছে কি করে সব নিয়ে এন্তার আগ্রহ তাঁর।

শুভার্থীদের মধ্যে পেডড্রোলা পানির পাম্পের মালিক সুহৃদ ব্যক্তিটি চট্টগ্রাম থেকে একদিন বিচিন্তার বকেয়া বিজ্ঞাপন বিলের একটি চেক পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, এখন আপনাদের টাকার প্রচুর দরকার।

এর বিপরীত অভিজ্ঞতাটিও আছে। তখনও প্রতি সপ্তাহে আমি ঢাকা হকার্স ইউনিয়নের মাধ্যমে পত্রিকা বিক্রির টাকা আনতে যেতাম। অনেক দিন তারা একসঙ্গে এত টাকা দিতে পারত না। টাকার পেমেন্ট দিত দুটি কিস্তিতে । টাকা আনতে হকার্স ইউনিয়নে গেলে তারা আমাকে কিভাবে বসাবে-খাওয়াবে সে নিয়েও নানান প্রতিযোগিতা চলত। কিন্তু বিচিন্তা নিষিদ্ধের পর হকার্স ইউনিয়নে যেতেই ভিন্ন আচরণ দেখি। আমার আর সেখানে পুরনো কোন কদরই নেই। টাকার কথা তুললে দেখি-দেব বলে। সারাদেশের বেশিরভাগ পত্রিকা এজেন্টের কাছ থেকেই একই আচরণ পাই।

॥ দুই ॥

খবর আসে প্রতিদিন একটি মেয়ে মিনার মাহমুদের সঙ্গে কারা ফটকে দেখা করতে যায়। ধানমন্ডির ফিন্যান্সার ম্যাডামের বাড়ি থেকে খবরটি আসে। এ নিয়ে আমাদের ওপর পড়ে গোয়েন্দাগিরির বাড়তি দায়িত্ব। তখনও আমরা মিনার মাহমুদ তথা ফিন্যান্সার ম্যাডারের বাড়িতে থাকি। তার টাকায় খাই-দাই। কাজেই নতুন দায়িত্বটি নিয়ে অবহেলা করি না।

গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়ে আসে এ মানুষটি কবিতা। তবে সে আমাদের অপরিচিত কেউ নয়। এই কবিতা আবার মিনার মাহমুদের স্ত্রী কবিতা নন। বিচিন্তার সাংবাদিক কবিতা। পাপড়ি নামে তিনি বিচিন্তায় লিখতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়েই তাঁর তখনও মূলত আগ্রহ-ব্যস্ততা। আর তিনি তখন পেশার চাইতে ব্যক্তি মিনার মাহমুদকে বেশি ভালোবাসতেন। অনেকদিন ধরেই আমরা ব্যাপারটি বুঝতাম-জানতাম। এ নিয়ে তাঁর বেশ কিছু বাড়াবাড়িও চলত। যেমন আমাদের প্রচন্ড কাজের ব্যস্ততার সময়েও ফোন করে তিনি মিনার মাহমুদের অবস্থান নিয়ে নানা তথ্য জানতে চাইতেন। এসব তথ্য দিতে আমাদের কোন রকম দেরি বা অনাগ্রহ দেখলে প্রণয়িনীর দাবিতে রীতিমতো উষ্মাও দেখাতে ভুলতেন না।

মিনার মাহমুদের তখনও অফিসিয়েল একটি ঘর সংসার আছে। কিন্তু তারপরও পাপড়ি কবিতার তাঁকে অন্ধের মতো ভালবাসাবাসির বিষয়টি বিচিন্তার বেশিরভাগ কর্মী পছন্দ করতেন না। আবার আমাদের কাছে মুখে নানা বিরক্তি দেখালেও বোঝা যেত রমণীমোহন মিনার মাহমুদ পুরো বিষয়টিকে বেশ এনজয় করেন। উৎসাহ-প্রশ্রয় জোগান। নিয়মিত কাজে লাগাতেন পাপড়ি কবিতার ভালোবাসার দাবি।

মিনার মাহমুদের গ্রেফতারের পর এ নিয়ে পাপড়ি কবিতার ভালোবাসাবাসি নিয়ে বিচিন্তা কর্মীদের ক্ষোভ বাড়ার কারণ আমরা সবাই সম্পাদকের জামিনের চিন্তায় উকিল-মোক্তারদের নিয়ে ব্যস্ত। এসব উকিল মোক্তারের আয়োজন-তদারকি নিয়ে নব্য প্রণয়িনীর কোন ভূমিকা নেই। অথচ প্রতিদিন ফোন করে তিনি এসবের অগ্রগতি জানতে চান।

কারা ফটকে তাঁর এমন যাতায়াত নিয়ে বিচিন্তার ফিন্যান্সার ধানমন্ডির ম্যাডাম ক্ষুব্ধ-বিরক্ত হয়ে উঠলে খবরটিতে আমাদের উদ্বেগ বাড়ে। কারণ আমাদের দলটির নিয়মিত রসদপাতি তখনও তাঁর দয়া সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে রীতিমতো প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। কারাফটকে টাকার সঙ্গে আদেশ যায় এ নাম এবং আকারের কোন মেয়ে যাতে দেখা করতে না পারে।

॥ তিন ॥

এ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী তখনও থাকতেন সেগুনবাগিচার বাড়িতে। এরশাদ বিরোধী আইনজীবী আন্দোলনের তিনি অনড়-কঠিন নেতা।

ফিন্যান্সার ম্যাডাম নিজে যোগাযোগ করে তাঁকে মিনার মাহমুদের আইনজীবী নিয়োগ করেছেন। এর আগে দু'বার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন বাতিল হয়েছে।

শামসুল হক চৌধুরী দায়িত্বটি নেবার পর ধীরে ধীরে কোর্টের আচরণ পাল্টাতে থাকে। কারণ গ্রেফতার উপলক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার সৃষ্টি করলেও আর দশটা কেসের মতোই এক্ষেত্রে পুলিশি তদন্ত তৎপরতার অগ্রগতি নেই।

এরশাদের বিরুদ্ধে লিখার কারণে সামরিক স্বৈরাচারী পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে। যে সংবিধান লংঘনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজে রাষ্ট্রদ্রোহের কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে লিখলেই যে তা রাষ্ট্রদ্রোহ হয় না তা আইন, পুলিশ সবাই জানে।

শামসুল হক চৌধুরী এরপর মিনার মাহমুদের জামিনের আবেদন নিয়ে যান জজ আদালতে। সেখানে এই কথাগুলোই উল্লেখ করে বলেন, সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেছে এটি আমরা কোর্টে লড়ব। এখন আমাদের জামিন চাই। তাছাড়া একজন সংবাদিককে জামিন দিলেই সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। বিচারক মাথা নাড়েন।

আদালতের শেষে শামসুল হক চৌধুরীকে ফলাফল জানতে চাইলে হাসিমুখে বলেন , হেঁ কইছেতো। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি এ 'হেঁ' উচ্চারণটাই জামিন। মিনার মাহমুদকে জামিনে মুক্তির জন্য শামসুল হক চৌধুরী কোন সম্মানি নেননি। মুক্তির পর বেশ কয়েক কেজি মিষ্টি তাঁর বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন ফিনান্সার ম্যাডাম। তিনি সেই মিষ্টিও গ্রহণ করেননি।

॥ চার ॥

কারামুক্ত মিনার মাহমুদ তখন আরও বেপরোয়া মানুষ। পত্রিকার কোন খবর নেই। তাঁর বিরামহীন বিয়ার পান-নৈশ বিহার সব শুধু বাড়ে। দিনে দিনে বিচিন্তার দলটিও ভেঙ্গে-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি বঙ্গব্যাপী নামের একটি পত্রিকায় কাজ নেই। চাকরিটির ব্যবস্থা করে দেন ওয়ার্কার্স পার্টির সেই সুহৃদ বন্ধু ছোটনভাই। কাজী মন্টু তখন পত্রিকাটি দেখতেন। ছোটনভাই একদিন তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি তখনই জয়েন করতে বলেন। সব মিলিয়ে ৩১৫০ টাকা বেতন। সহকারী সম্পাদক হিসাবে সে পত্রিকাটির কপি দেখতেন কবি তুষার দাশ।

মোজাম্মেল বাবুর পূর্বাভাস পত্রিকায় যোগ দেন আমিনুর রশীদ। তাঁর আগের পত্রিকা দেশবন্ধু নিষিদ্ধ করে স্বৈরাচারী এরশাদ। সেই দেশবন্ধু পত্রিকাটিই আজকের শিশির ভট্টাচার্য, আনিসুল হক এদের প্রথম সূতিকাগার। বিচিন্তার জীবনের মতোই পুরানা পল্টন লাইনের পূর্বাভাস অফিসে আমিনুর রশীদ থাকতে শুরু করেন।

এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে বিচিন্তা নিষিদ্ধ হয়েছে। আর সেই আনোয়ার শাহাদাতই এরশাদের লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে চাকরি নেন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়েরই প্রেস শাখায়। পরে সেখানকার ফিনান্সে বের করেন সাপ্তাহিক আসে দিন যায় নামের একটি পত্রিকা। আসিফ নজরুল কাজ পেয়ে যান বিচিত্রায়। বিচিন্তার এমন আরও নানা কর্মী নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন।

এরশাদের এক সময়কার মন্ত্রী শফিকুল গনি স্বপন সাপ্তাহিক বঙ্গব্যাপী পত্রিকাটির মালিক সম্পাদক। এরশাদ কেবিনেটের পূর্তমন্ত্রীর পদ থেকে চাকরি হারানোর পর অনেক দিন তিনি চুপচাপ ছিলেন। এক পর্যায়ে ১৭/১ ইস্কাটন গার্ডেনের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে বঙ্গব্যাপী আর ইংরেজি সাপ্তাহিক ফ্রাইডে পত্রিকা দুটি বের করেন। এখানে কাজ করতে এসে প্রথম দিন থেকে বুঝতে পারি এতদিন বিচিন্তার কাজটি ছিল স্বপ্নের মিশনের অংশ। আর এখানকার কাজটি স্রেফ চাকরি।

এখানে কাজী মন্টু ছাড়াও মইনুদ্দিন নাসের, ফরিদ হোসেন, তুষার দাশ ছাড়াও টাকার জন্য বাঘা বাঘা যেসব লোক চাকরি করেন বা কন্ট্রিবিউটর হিসাবে কাজ করেন তারা মূলত মালিকের প্রয়োজন মেটাতে হিসাব করে প্রতিটা অক্ষর লেখেন। মুখে বলেন আমি ভাই প্রফেশনাল মানুষ। এটিই নাকি প্রফেশনাল জার্নালিজম!

আমার পরে বঙ্গব্যাপীতে রিপোর্টিং-এ যোগ দেন শ্যামল দত্ত। কিন্তু তাঁর সেখানে যোগদান ভাগ্যটি সুখের ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে সদ্য ঢাকা আসা শ্যামল তুষার দাশের বন্ধু হিসাবে অফিসে আসা যাওয়া করতেন। পত্রিকার প্রোডাকশন, পেস্টিং এসব তিনি ভালো জানতেন-বুঝতেন।

তুষার দাশ যখন প্রথম তাঁকে রিপোর্টিং-এ নিতে চান তখন শফিকুল গনির আপত্তির কারণে শ্যামলকে প্রথমে পেস্টিং-এর কাজে লাগানো হয়। পরে নিজস্ব কাজের গুনেই পত্রিকার রিপোর্টিং টিমের সদস্য হয়ে যান শ্যামল। তিনিই পরে সংবাদপত্র জগতের ডাকসাইটে কূটনৈতিক প্রতিবেদক হয়ে ওঠেন। এখন তিনি ভোরের কাগজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। টিভি উপস্থাপক।

॥ পাঁচ ॥

শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে আমি তখন একটি ডিগ্রী অর্জনেরও কাজ করেছি। কাকতালীয়ভাবে শ্যামল আর আমি দু'জনেই ছিলাম পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা পাস। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক থেকে পাস করেন শ্যামল। আমি ফেনী পলিটেকনিক থেকে। আমরা দু'জনে ডিগ্রী পরীক্ষা দেবার আগ্রহ দেখালে তুষার দাশ সহযোগিতার হাত বাড়ান।

তাঁর এক কবি বন্ধু তখন আবুজর গিফারী কলেজের শিক্ষক। ভদ্রলোক নির্ধারিত ফী নিয়ে আমার আর শ্যামলের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নেবার ব্যবস্থা করে দেন। বাংলা, বাংলা ঐচ্ছিক, দর্শন, সমাজকল্যাণ এগুলো ছিল আমাদের পরীক্ষার সাবজেক্ট । কিন্তু আমরা তখন ফুল টাইম রিপোর্টার। কোনদিন ক্লাসে যাইনি। বইপত্র দেখতে কেমন তাও জানি না।

দু'জনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে একটি কৌশল বের করি। প্রতিটি সাবজেক্টের সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রের ফটোকপি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আড্ডায় বসতাম। সেখানে তারা প্রশ্ন এর উত্তর নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। শিউলী নামের আমার এক বান্ধবী তখন ঢাবির দর্শন বিভাগে পড়তেন। শিউলীই এসব আড্ডার ব্যবস্থা করে দেন।

আজকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমাদের পরীক্ষা কেন্দ্র। প্রতিদিন পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের অন্তত একঘন্টা আগে আমরা দু'জন ইস্কাটন গার্ডেন থেকে রিকশা নিয়ে বেরোই। জগন্নাথ ক্যাম্পাস পর্যন্ত যেতে যেতে আবার আমরা সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর সমগ্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম। এটিই ছিল আমাদের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি।

আমাদের দু'জনের পরীক্ষা নিয়ে কেন্দ্রটির ভিতর তখন বিশেষ একটি আলোচনাও জমে উঠেছিল। আমাদের পেশার পরিচয় কর্তৃপক্ষ জানতেন না। পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষকরা দেখতেন প্রতিদিন পরীক্ষার উত্তরপত্র-প্রশ্নপত্র হাতে নিয়েই আমরা অবিরাম নিজের ভাষায় লিখে যাচ্ছি। একটির পর একটি চেয়ে নিচ্ছি অতিরিক্ত উত্তরপত্র। অন্যসব পরীক্ষার্থীরা যেখানে মাঝে মাঝে টয়লেটে যায় আমরা তাদের দলেরও নই।

একদিন এক পরীক্ষক সাগ্রহে বলেন আপনাদের পরীক্ষা খুব ভালো হচ্ছে মনে হচ্ছে। একবার টয়লেটেও যানটান না! ওই প্রশ্নে আমি আর শ্যামল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসি। আসলে আমরা অন্য সুযোগ সন্ধানী পরীক্ষার্থীদের মতো টয়লেটে গিয়েই বা কি করব! বইয়ের কোথায় কোন প্রশ্ন বা উত্তরগুলোই বা কোথায় লেখা এর কিছুই যে আমরা জানি না।

॥ ছয় ॥

আমাদের পরীক্ষার ফলাফল সাফল্য বন্ধু মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শিউলীর আনন্দ প্রতিক্রিয়াটি ছিল দেখার মতো। শিউলী টাঙ্গাইলের মেয়ে। ঢাবির তখনকার দর্শন বিভাগের ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সখ্যের বিষয়টিও জীবনের একটি অংশ হয়ে আছে। আমার সংবাদপত্রে পেশায় আসার দীর্ঘ কাহিনীরও অন্যতম সাক্ষী চরিত্র শিউলী।

আমাদের প্রত্যেকের এ পেশায় আসা নিয়ে নানা কাহিনী আছে। আমার কাহিনীটি প্রথমে একজন পাঠকের। তারপর পত্র লেখকের। স্কুলে-কলেজে পড়াশুনার সময়ে পত্রিকায় চিঠি লেখার বিষয়টির সঙ্গে স্বপ্নের মতো একটি সম্পর্ক ছিল।

তখন বাড়ি থেকে মাসিক টাকা পাবার পর প্রথমে ডাকঘরে গিয়ে একসঙ্গে প্যাকেট প্যাকেট খাম কিনতাম। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা কাগজের প্রায় প্রতিটিতেই চিঠিপত্র বিভাগে প্রতি সপ্তাহে চিঠি পাঠাতাম। এক সপ্তাহে চার-পাঁচটি পত্রিকায় চিঠি না ছাপালে মনে হতো জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল!

বিচিত্রা, চিত্রালী পত্রিকার পত্র লেখকদের আলাদা সংগঠনও তখন ছিল। যেমন বিচিত্রা পাঠক ফোরাম। চিত্রালী পাঠক পাঠিকা চলচ্চিত্র সংসদ, চিপাচস। নানা কারণে চিপাচস সংগঠনটি ছিল প্রাণবন্ত। কারণ আজকের যে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনটির চিপাচসের মাধ্যমে গোড়াপত্তন হয়েছে। তখন অসুস্থ ধারার ছবি নির্মাণ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে চিপাচস এফডিসিতে ওয়ার্কশপ করতে গেলে দেলোয়ার জাহান ঝন্টু মার্কা বায়োস্কোপ নির্মাতার লাঠিয়াল দোসরা হকি স্টিক হাতে চিপাচস কি পাইছস বলে আমাদের মারতে আসে। চিপাচসের প্রতিবাদের মুখে তখন হল থেকে অসুস্থ ছবি নামিয়ে নেবার ঘটনাও ঘটেছে।

এখনকার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শামসুজ্জামান লোদী, সুশীল কুমার